Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

অবলুপ্তির আর এক অধ্যায় : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কৃষিভিত্তিক লোকাচার

ড. পীযূষ সরকার

Link : https://bit.ly/49574Cl

সারসংক্ষেপ : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান। বাদাবনের এই মাটিতে লেপ্টে আছে লোকসংস্কৃতির নানান দিক; তার মধ্যে অন্যতম লোকাচার। এই অঞ্চল মূলত কৃষির উপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষের জীবন যাপিত হয়। এই প্রবন্ধে অবলুপ্ত হতে বসা কৃষিভিত্তিক লোকাচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : কাদা মারা, দাওয়া সারা, গাদা দেওয়া, গোলা বা করু, বেনাকি ঠাকুর, বাউনি

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও ভাবধারার বিশেষ অংশীদার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নাম বেশ পরিচিত। এই জেলাটি আগে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার কারণে ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ চব্বিশ পরগনা ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আয়তনের দিক থেকে ৮১৬৫.০৫ বর্গকিমিতে অবস্থিত জেলাটির মধ্যে বিরাজমান পাঁচটি মহকুমা — আলিপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ। আর এই জেলাটির ভৌগোলিক অবস্থান ২২.৩৭' থেকে ২১.২৫'৩০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.১'২৫" থেকে ৮৯.৬'১৫" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। এই জেলার মানুষের মনের মধ্যে বৈচিত্র্যের নানান সমাবেশ দেখা যায়, যেগুলি লোকবিশ্বাসের একেকটি ধারা। এই সমষ্টি ধারার সমন্বয়ে ধরা পড়ে লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট রূপ। সেগুলি যথাক্রমে লোকাচার, লোকচিকিৎসা, লোকক্রীড়া ইত্যাদি। শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকাচার এর ক্রমাগত বিলীয়মান রূপ নিয়ে প্রবন্ধের রূপায়ণ।

লোকাচারের উদ্ভব কাল নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আদিতে সাধারণ মানুষ ধর্মাচার, বিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্মিলিত জীবনচর্চা পরবর্তীকালে লোকাচার ও সামাজিক প্রথায় রূপ পায়।

জীবনের মূল মন্ত্র বেঁচে থাকা। এই জেলার লোকায়ত স্তরের সাধারণ মানুষের উদযাপিত লোকাচারের শতেক কাহিনি বলে শেষ করা যায় না। কৃষিভিত্তিক প্রান্তিক স্তরের লালিত লোকাচারের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজে ধরা পড়ে — এক. প্রতিটি গৃহস্থ চাষি পরিবারের লোকাচার রূপ পায় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে, যার মধ্যে ধর্মীয় দিকটি হলো লোকায়ত দেবদেবী ও পীরপীরানির পুজো। দুই. লোকাচার দিয়ে কৃষিবর্ষ চক্রের সূচনা হয়, যেখানে থাকে মাঙ্গালিক আচার অনুষ্ঠান। মূলত এর মধ্যে দিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, যেমন অনাবিল আনন্দ পায়, তেমনি আগামীদিনে নতুন ফসল লাভের স্বপ্ন বয়ন করে। তিন. লোকাচারের মধ্যে কখন যে ধরা দেয় সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যচিন্তা, তা ভাবতে শিক্ষিত মানুষ গবেষণা করেন।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করে ধান চারা বা বীজতলা রোপনের পর বৃষ্টি যত বাড়বে, ধানগাছের বাড়-বাড়ন্ত রূপ আবাদি ক্ষেত ভরে উঠবে। দেখতে দেখতে শরতের হিমেল হাওয়ায় ভরা যুবতীর মতো দুলতে থাকবে আবাদি ক্ষেতের রোয়া বিয়ন।

প্রায় একমাস পরে অজান্তে প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভবতী হয়ে উঠে ধানী ক্ষেত। গর্ভ থোড়ের বুকের মধ্যে উঁকি মারে কচি ও কাঁচা ধান শিষের বিপুল সম্ভার। মাস ঘুরতে না ঘুরতে হেমন্তের নবীন ছোঁয়ায় সবুজ ধানক্ষেতে আসে সোনালি আভা, ভরে যায় সারা মাঠ। কার্তিকের মাঝামাঝি সময় এলে ধান গাছ শিষের ভারে নুয়ে পড়ে। গৃহস্থ পরিবার, কৃষিজীবী সম্প্রদায় তোড়জোড় শুরু করে ফসল কেটে ঘরে তোলার জন্য।

ধানকাটার প্রথম দিনটি খুব পবিত্রতা সহকারে মানা হয়। পাকা ধানক্ষেতে কাদা মাটি দিয়ে কাল্পনিক লক্ষ্মীমূর্তি তৈরি করে শাঁখ-কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজে চাষী কর্তা পূজার আসনে বসে। পূজা হওয়ার পর ধানচ্ছেদন করা হয়, চলবে দু-আড়াইমাস অবধি। এই সমস্ত পর্বটি কতকগুলি লোকাচারের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় যাতে কৃষিদেবতা খুশি হয়ে গৃহস্থ পরিবারকে সচ্ছল রাখেন।

ক. আগতোলা : একেবারে প্রথমে ধানকাটার পর আগড়ে আছড়ে পড়া ধানকে মরশুমের শুরুতে গলাজাত করা হয়, এই রীতিকে লোকভাষায় বলা হয় আগতোলা। কাজটি মঙ্গলময় দিন অনুসারে করু বা গোলায় তুলে রাখতে হয়। বাড়ির কর্তা বা গিন্নী স্নান করে শুচি হয়ে ধান বোঝাই খড়ের উপর ফুল, দূর্বা, গঙ্গাজল গোলা বা মরাইয়ে তোলেন। 'আগ' কথাটির আভিধানিক অর্থ বুঝিয়ে দেয় অগ্র বা প্রথম। আগতোলার কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায় নতুন-খাওয়া বা নবান্নের দিন।

খ. হালকাটা : কৃষিবর্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শেষ লোকাচার পালিত হয় 'হালকাটা' পূজা দিয়ে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে হালকাটা পূজার আয়োজন হয়। মূলত ধান কাটা এবং তোলা শেষ হবার মুখে, তারা ধানক্ষেতের এক প্রান্তে হালকাটার আয়োজন করে। কাদামাটি দিয়ে ধানক্ষেতে এক অদ্ভুত এক মূর্তি তৈরি করা হয়, দেখতে অনেকটা সরীসৃপের মতো। এর মধ্যে রয়েছে আদিমতার ছাপ যা আঞ্চলিক ভাষায় 'বেনাকি ঠাকুর' হিসাবে পরিচিত। অনেকে বলেন 'মা লক্ষ্মীর চর'। তা যাই হোক এই পুজোয় বেনাকি ঠাকুরের সঙ্গে লক্ষ্মীর পূজা খুব নিষ্ঠা সহকারে করা হয়। এখানে লৌকিক ও পৌরাণিকের অনেকটা মেলবন্ধন ঘটেছে।

ধানক্ষেতের পূজা স্থানটিতে গৃহকর্তার সঙ্গে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা হাজির হয়। পূজার উপচার দিয়ে পূজা ক'রে বামুন মশাই বাম হাত দিয়ে এক মুঠো ধানের গোছা (গোচ) ধরেন আর গৃহকর্তা সেই গোছা ডাল হাতের মধ্যে আনেন। এই বামুন ঠাকুর গোচ কাটতে কাটতে বলবেন — কার ক্ষেতে বহর পড়ে? গৃহকর্তা স্বনাম উচ্চারণ করে বলেন, 'অমুকের ক্ষেতে পড়ে'। কর্তা সেগুলি সযত্নে তুলে রাখবেন আর কাটা খড়গুলি নিয়ে বাচ্চারা মাতামাতি ও আনন্দ করবে।

গ. কাদা সারা ও দাওয়া সারা : কৃষিচক্রের মধ্যে সম্মিলিত প্রীতিভোজ ও নিমন্ত্রণ উৎসব হলো কাদা সারা ও দাওয়া সারা। গ্রামের কৃষকরা রোদ-জল-কাদাকে সর্বক্ষণের সঙ্গী করে চাষের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে রাখেন। চারাধান রুইয়েন (যাঁরা ধান রোপন করেন) দ্বারা কাদা করা জমিতে রোয়া হয়। এই কাজ শেষ হয়ে এলে জমির মালিক একটি নির্দিষ্ট দিনে সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। একেই বলা হয় কাদা সারা — এই অনুষ্ঠান বা লোকাচারটি রাতে হয়; যেখানে চাষিরা ছাড়াও অনেক আত্মীয় আমন্ত্রিত হন।

ঠিক তেমনই কাদা সারা'র তিন মাস পর ধান কাটা তোলা হয়; তখন এই অঞ্চলে আমন্ত্রিত পর্বটিকে বলা হয় দাওয়া সার। অর্থাৎ একটি হয় রোপনে আর অন্যটি ছেদনে। এই 'দাওয়া' শব্দটি 'দাওয়াত' শব্দ থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ নিমন্ত্রণ। কাদা সারা ও দাওয়া সারা দুটি উল্লেখযোগ্য কৃষিভিত্তিক লোকাচার; যেখানে গ্রামীণ মানুষের আশার আশ্বাসটি নিবেশিত।

ঘ. ধানের গাদায় সার দেওয়া : ধানক্ষেত থেকে ধান তুলে যত তাড়াতাড়ি ধান খামার জাত করা হবে, ততই চাষির লাভ। আর এই কাটা ধানকে বেশিদিন ফেলে রাখা যায় না — তাই ধানকে গাদা দেওয়া হয়। যিনি গাদা দেন তাঁর সুকৌশলী হাতে গাদা দাঁড়িয়ে যায়। তবে অনেক সময় বেশি ধান হলে একদিনে গাদা দেওয়া যায় না, অথচ গাদায় সার দেওয়ার আগে, গাদা ছাড়া যায় না; তখন দিনের শেষে সবাই সম্মিলিত ভাবে খামারে ছড়িয়ে থাকা ধান মুঠো করে তুলে নেবেন আর বাম হাত দিয়ে গাদা ছুঁয়ে বিড়বিড় করে তিনবার বলবেন 'যত ধানে তত শিষ।/শত্তুরে যা বলে তাই দিস'। তার পর ডান মুঠোয় থাকা ধান গাদায় ছুঁড়ে লক্ষ্মী দেবীকে প্রণাম করেন।

গাদায় সার দেওয়া শস্য সংরক্ষণের প্রাচীন এক পদ্ধতি, যেখানে মানুষ সভ্য হওয়ার সম্মান রাখে। কারণ চাষবাস শুরু করার আগে মানুষ যাযাবরের জীবনযাপন করত।

ঙ. বাউনি ও পিঠে পার্বণ : কথায় আছে কারোর পৌষ মাস আর কারোর সর্বনাশ। অর্থাৎ পৌষ মাসের মধ্যে নিহিত আছে সমৃদ্ধের বাণী। এই মাসে আঞ্চলিক মানুষজন নতুন করে বাঁচার স্বাদ পায়। সারা বছরের আকাঙ্ক্ষিত আমন ফসলে ভরে যায় চাষির ঘর-দুয়ার। সৌভাগ্যের মাস যে পৌষ মাস, তা সাক্ষর রাখে। নিরন্ন গরীবের ঘরেও বিচ্ছিন্ন ভাবে আমন ধান কিছু কিছু সংগৃহীত হয় যা দিয়ে পৌষপার্বণের আয়োজনও হয়।

বাউনির মধ্যে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় কৃষি পরিবারের ভাঁড়ার বাঁধার জন্য নানাবিধ লোকাচার। কারণ কৃষি পরিবার যাতে খাওয়ার কষ্ট না পায় তার জন্য এই প্রথার প্রবর্তন হয় প্রাচীনকালে। পৌষ সংক্রান্তিতে পাঁচ ,সাত অথবা নয়টি বিজোড় সংখ্যার একহাত লম্বা ধানের শিষ সমন্বিত গাছকে নিয়ে মেয়েদের বিনুনির মতো দু'হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁধতে হয়। এই খড়ের বিনুনিগুলি বঙ্গনারীর মাথার বিনুনির মতো দেখতে হয় বলে ধান শিষের এই বিনুনিকে চলতি ভাষায় বলা হয় বিউনি বা বিপনি বা বাউনি।

পৌষ সংক্রান্তির সকাল থেকে এই ভাঁড়ার বাঁধার আয়োজন হয়। এই কাজের মূল হোতা হলেন কৃষিজীবী বঙ্গনারীরা। তাঁরা 'বাউনি'গুলি তুলসীতলায় অথবা গোলা বা মরাইয়ের সামনে থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। প্রত্যেক বাউনির উপর দেওয়া হয় দূর্বা ও তুলসীপাতা। এরপর 'রাশছলা' হয়। এই পদ্ধতিটি বেশ বিচিত্র ধরনের। একটি সাদা ন্যাতা (কাপড়ের তৈরি) দিয়ে চালগোলা জলে নিকানো হয় ধানের গোলা, গোয়াল ঘর, ঠাকুর ঘর, ঢেঁকিশালা, ভাঁড়ার ঘর পর্যন্ত। নিকানো অংশে অলংকৃত করা হয় ঢেঁকি, ধামা, কুলো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ফুল, পাখি, গোরু, লাঙল, জোয়াল, ধানের শিষ ইত্যাদি। অতীতে জ্যোতিষীরা মাটিতে দ্বাদশ রাশি এঁকে গণনা করতেন। সম্ভবত সেই ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালিরা বহন করে; জড়িয়ে যায় 'রাশছলা' নামে। প্রতিটা অঙ্কনের মধ্যে শস্য ও সম্পদের দেবদেবীকে প্রণাম জানানো হয়।

পূজা শুরু হয় ধানের গোলা বা মরাইয়ের সামনে। একটি জলচৌকি বা কাঠের চৌকির উপর স্থাপন করা হয় পূজার ঘট, কাছে রাখা হয় বেতের পালি' যাতে ভরা থাকে আতপ চাল; তার উপর রাখা হয় সিঁদুর মাখানো বাউনিগুলি। শাঁখ, কাঁসা ঘণ্টার ধ্বনিতে বাউনি স্থাপন করা হয়। যিনি স্থাপন করেন, তিনি উচ্চারণ করেন, 'ঠাকুর-ঠাকরুন গেছে গঙ্গাস্নানে/ তুমি ঠাকরুন থেকো/ ভাঁড়ার আর গোলা তিন দিন মুনে'। বাউনি স্থাপনের জায়গাটি সাধারণত তিনদিন অব্যবহৃত থাকে। সর্বোপরি এই লোকাচারটির মধ্যে লক্ষ্মীকে আপন করে রাখার প্রয়াস ধরা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এইটুকু আমাদের মনের আঙিনায় ধরা দেয় যে, লোকাচার লক্ষ্মীর লোকায়ত উপাদান আধুনিকতার অন্দরমহলে পড়ে তার নাভিশ্বাস উঠেছে। অপমৃত্যু হয়তো ঠেকাতে পারব না যদি না সচেতন হই — তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রবন্ধের মধ্যে ধরলাম, যাতে আমরা ও আগামী জানতে পারি আমাদের ঐতিহ্যের নির্যাসটুকু।

গ্রন্থ ঋণ :

১। কমল চৌধুরী, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১
২। ধূর্জটি নস্কর, 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', শ্যামলী প্রেস, কলকাতা, ১৯৯৭
৩। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়', নবচলন্তিকা, কলকাতা, ১৯৯৯
৪। নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২
৫। বিকাশকান্তি মিদ্যা, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০১০

তথ্যদাতা :

১। রমেন্দ্রসুন্দর নাইয়া, ৬৫ বছর, রায়বাঘিনী, ক্যানিং
২। মৃণাল হালদার, ৫২ বছর, দাড়া, জয়নগর
৩। রবীন পৈলান, ৭০ বছর, ধোসা, জয়নগর
৪। নিত্যানন্দ সরদার, ৬৩ বছর, বারুইপুর

লেখক পরিচিতি :

ড. পীযূষ সরকার : ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজে সহকারি অধ্যাপক। বর্তমানে কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। ২০২২ সালে কোলহান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. অর্জন। ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক বিদ্যাচর্চা করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপর বেশ কিছু লেখালেখি আছে।